**স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১ - পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বৃহস্পতিবার, ১০ চৈত্র ১৪১৭, ২৪ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পিকার,

সহকর্মীবৃন্দ,

মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমাদের ৪০ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই মহান নেতা ও ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্ম না হলে, আমরা এই স্বাধীন ভূখন্ড পেতাম না। পেতাম না জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত।

১৯৭১ সালের রক্তঝরা ঘটনাবহুল মার্চ। জাগ্রত বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠী তখন বাঙালিদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হতে থাকে। আসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ।

বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।' তিনি বাঙালি জাতিকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহবান জানান। যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দেন। ১১ মিনিটের এই মহাকাব্যিক ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি সংগ্রামের লক্ষ্য কী তাও বাঙালি জাতিকে বলে দেন। তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠ, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কার্যতঃ ৭ মার্চ থেকেই নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানি শোষকরা আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে। পাকিস্তান থেকে সৈন্য, অস্ত্র-সস্ত্র আনতে থাকে। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠান। বাঙালিরাও যুদ্ধের প্রস্ত্ততি নেয়।

এভাবেই আসে ২৫ মার্চের কালো রাত্রি। পাক হানাদার বাহিনী সৃষ্টি করে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর হত্যাকান্ড। হাজার হাজার ঘুমন্ত বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে। জাতির পিতা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় বলেন, ‘সম্ভবতঃ এটাই আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। ... চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই। জয় বাংলা।' তাইতো আমরা ২৬ মার্চকে মহান স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি।

আজকের দিনে আমি স্মরণ করি, জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাই, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। গভীর সমবেদনা জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে।

কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতসহ যেসব দেশ ও মানুষ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, সমর্থন দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে তাদেরকে।

স্মরণ করছি, মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদেরকে।

গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘৃণ্য চক্রান্তকারীদের গুলিতে জাতির পিতার সাথে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, আমার তিন ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশুভাই শেখ রাসেল এবং আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনকে।

স্মরণ করি, বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসনের সময় নিহত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরকে।

সুধিমন্ডলী,

আমি বিশ্বাস করি, আজকে আমরা যে যেখানে আছি দেশ স্বাধীন না হলে আমরা এ অবস্থানে আসতে পারতাম না। তাই ২৬ মার্চ বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পথে বলেছিলেন, ‘আমি শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করবো।' বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ,  শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেন।

তিনি এক বছরের মাথায় জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা - এ চার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের সংবিধান আজো বিশ্বনন্দিত।

বঙ্গবন্ধু দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষে কৃষির ওপর জোর দেন। বন্ধ হয়ে থাকা শিল্প-কলকারখানাগুলো চালুর ব্যবস্থা করেন। একটা ধ্বংসস্তুপ থেকে দেশকে টেনে তুলেন। দেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখনই স্বাধীনতার শত্রুরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। ক্ষমতায় চেপে বসে অবৈধ সরকার। সঙ্গে নেয় যুদ্ধাপরাধী এবং দেশদ্রোহীদের। স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভূ-লুণ্ঠিত হয়। দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেএেই পিছাতে থাকে।

বহু সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯১ সালে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় এসেই দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে মত্ত হয়ে পড়ে। দুর্নীতি ও অপশাসনের রাজত্ব কায়েম করে। পরে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে তারা সরকারের মেয়াদ পূরণের পূর্বেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

সুধিমন্ডলী,

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নিয়েই দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। দেশের রপ্তানি আয় দ্বিগুণ হয়। বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ, দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়। গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো হয়। বিদেশী বিনিয়োগ আসে। '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যার সময়ও রপ্তানির চাকা সচল রাখা হয়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা হয়। জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা পায়। দারিদ্র্য হ্রাস পায়। শিক্ষার হার বাড়ে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

বিএনপি-জামাত জোট ষড়যন্ত্র করে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে। এসেই তারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর নিপীড়ন, নির্যাতন চালায়। বহু নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। দেশে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা ব্যাপক লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, আর আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে। বিদেশে অর্থ পাচার করে। জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

স্বাধীনতা-বিরোধীদের মন্ত্রী বানায়। ৩০ লাখ শহীদের রক্তে ভেজা জাতীয় পতাকার চরম অবমূল্যায়ন করে। দেশকে আবার খাদ্য আমদানিকারক দেশে পরিণত করে। দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়ার পরিবর্তে কমে যায়।

সুধিমন্ডলী,

আওয়ামী লীগ যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই দেশের জন্য কাজ করেছে। এবারও সরকার গঠনের পরপরই আমরা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছি। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করেছি। জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছি। সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সকল সম্প্রদায়ের জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছি।

সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করতে দেয়া হবে না এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। তদন্ত শেষে শীঘ্রই বিচারকাজ শুরু হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব, আমাদের অহঙ্কার। মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা ও  স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমরা বিভিন্নমুখী  কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সম্মানী ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

চাকুরি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০ ভাগ কোটা তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্যও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ, উন্নত চিকিৎসার জন্য আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। জাতির পিতার জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাই একাত্তরের পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তিকে সংহত হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য নতুন প্রজন্মকে একাত্তরের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নতুন সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশচুম্বী। বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে বসেছিল। আমরা তাদেরকে চাঙ্গা করি। দেড় মাসের মধ্যে চাল, আটা, ডাল, ভোজ্যতেল সহ সবকিছুর দাম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনি।

বিগত দুই বছরে আমরা শিক্ষা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি, শিল্প, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাসত্মবায়ন করেছি। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করেছি।

কৃষি উৎপাদন আরো বৃদ্ধির লক্ষে আমরা সারের দাম তিন দফা কমিয়েছি। এ বছর ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদেরকে ৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। প্রতি ইঞ্চি কৃষি জমি আবাদ করতে কৃষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সফটওয়্যার এবং তথ্য প্রযুক্তি-সেবা রফতানির লক্ষে আইসিটি আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন করা হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সফটওয়ের টেকনোলোজী পার্ক স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আইটি ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় ই-তথ্য কোষ চালু করা হয়েছে।

আমরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শ্রমজীবী মানুষের বেতন বৃদ্ধি করেছি। নিম্নআয় ভোগীদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করেছি। ওএমএস ও ফেয়ার প্রাইস কার্ড চালু করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১,৬৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। গত দুই বছরে মাথাপিছু আয় ৬৬০ ডলার থেকে ৭৮০ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশ এখন একটি উদার, গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিশু মৃত্যু হার হ্রাস সংক্রান্ত এমডিজি-৪ অর্জনে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। এই জন্য জাতিসংঘ আমাদেরকে এমডিজি পদক দিয়েছে।

এমডিজি-৫ সহ প্রতিটি লক্ষে অর্জনেই আমরা এগিয়ে আছি। নারীর ক্ষমতায়নে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে।

দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে।

গত দুই বছরে আমরা ১৪শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ করেছি। ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

যানজট নিরসনে ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা নতুন করে প্রায় ১১ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। বিএনপি-জামাত জোট সরকার এগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে আমরা ১৮ হাজার ক্লিনিক স্থাপন করবো। সাড়ে তের হাজার কম্যুনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে এ পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই বিভিন্ন পদে আরো প্রায় ৫১ হাজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রকৌশল, চিকিৎসা সহ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে আমরা যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। ২ লাখ ২১ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। ন্যাশন্যাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার অধিকাংশই নারী।

আমাদের ‘৯৬ সরকারের সময় জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এবার আমরা বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করছি।

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্তগণ,

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পুরস্কার এই ‘স্বাধীনতা পুরস্কার'। এবারের পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। এ পদক পাওয়ায় জাতির প্রতি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো বেড়ে গেল।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের আরো অনেক কিছু করার আছে। আমরা এখনো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারিনি। দেশের সার্বিক অগ্রগতির সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে একটি সুষম সমাজ গঠন করতে চাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্বপ্নই দেখতেন। তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষেই ছিল সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। যা আজো অর্জিত হয়নি।

আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। তখন বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্য নিয়ে আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছি। রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে  আত্মনিয়োগ করি। ৪০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......